بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ নভেম্বর ২০২২ মোতাবেক ১৮ নবুয়্যত ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র জীবনচরিত এবং (তাঁর) জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যে মর্যাদা ছিল– এ সম্পর্কে পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আরো যা বর্ণিত হয়েছে তাথেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করতে চাচ্ছিলেন। বরং তিনি এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কেই তাঁর (তিরোধানের) পর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানাবেন। অতএব হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় আমাকে বলেন, আবু বকর ও তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন যেন আমি একটি ওসীয়্যত লিখে দেই। আমার ভয় হলো কোনো বাসনাকারী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে বা কেউ বলবে যে, আমি বেশি অধিকার রাখি। কিন্তু আল্লাহ্ এবং মু'মিনরা তো আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে মেনে নিবে না। অর্থাৎ অন্য কেউ দাবি করলেও তাকে অস্বীকার করা হবে, হযরত আবু বকর (রা.)ই স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এছাড়া হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)'রও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি না তোমাদের মাঝে আমি আর কতদিন বেঁচে থাকব। অতএব তোমরা আমার আনুগত্য করো আর তাদের (আনুগত্য করো) যারা আমার পরে রয়েছেন। আর (এর দ্বারা) তাঁর ইঙ্গিত আবু বকর এবং উমর (রা.)'র প্রতি ছিল।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে একটি কূপের পাশে দেখি যাতে একটি বালতি ছিল। আমি সেই কূপ থেকে (বালতি) টেনে আল্লাহ্ যতটা চেয়েছেন পানি তুলেছি। এরপর আবু কোহাফার পুত্র সেই বালতি নেন এবং তা থেকে এক বা দুই বালতি পানি টেনে তোলেন আর তার টেনে তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্বলতাকে ঢেকে রেখে তাকে ক্ষমা করবেন। অতঃপর সেই বালতি চামড়ার একটি বড় বালতি হয়ে যায় আর খাত্তাবের পুত্র তা গ্রহণ করেন। লোকদের মাঝে আমি কখনোই এমন শক্তিশালী মানুষ দেখি নি যিনি এভাবে পানি টেনে তুলতে পারে যেভাবে তিনি উঠাচ্ছিলেন। তিনি এত পানি তুলেন যে, মানুষ পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসে যায়। অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর উভয়ের সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, তাঁর (সা.) পর তারা স্থলাভিষিক্ত হবেন।

ইফ্‌কের ঘটনার সময় হযরত আবু বকর (রা.)'র যে ভূমিকা রয়েছে আর তাঁর যে বিশেষত্ব রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ তো ইতঃপূর্বের সাহাবীদের স্মৃতিচারণের সময় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত অংশ উপস্থাপন করছি যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর এত বড় অপবাদ আরোপ করা হয় যেন এক পাহাড় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)'র পিতামাতার নিজের কন্যার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম এবং তাঁর প্রতি সম্মানের মাত্রা অনেক গুণ বেশি ছিল। তারা এই পুরো সময় জুড়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজ কন্যাকে সেই অবস্থায়ই থাকতে দেন যে অবস্থায় রাখা মহানবী (সা.) সমীচীন মনে করেছেন। এমনকি একবার হযরত আয়েশা (রা.) পিত্রালয়ে এলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তখনই নিজ গৃহে ফেরত পাঠিয়ে দেন। যেভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইফ্‌কের ঘটনার সময় হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে এক ভৃত্যের সাথে পিত্রালয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ঘরে প্রবেশ করার পর আমার মাতা উম্মে রুমানকে ঘরের নিচতলায় আর হযরত আবু বকরকে ঘরের ওপরতলায় পাই। তিনি কুরআন পড়ছিলেন। আমার মা বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! কী মনে করে এলে? আমি তাকে উত্তর দেই এবং সেই ঘটনা তার কাছে বর্ণনা করি। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখি যে, তিনি এতে ততটা আশ্চর্য হন নি যতটা আমি হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এ ঘটনা শুনে তিনি চিন্তিত হবেন, কিন্তু তিনি মোটেও উদ্বিগ্ন হন নি। হযরত আয়েশা (রা.)'র মা বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! নিজের বিরুদ্ধে আরোপিত এসব কথাকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করো, কেননা খোদার কসম! এমনটি খুব কমই হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির সুন্দর স্ত্রী আছে এবং যাকে সে ভালোবাসে (আর) তার কয়েকজন সতীনও রয়েছে, কিন্তু তারা তাকে হিংসা করে (না) এবং তার সম্পর্কে রটনা করা হয় (না)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি দেখি, তার ওপর এ ঘটনার ততটা প্রভাব পড়ে নি যতটা আমার ওপর পড়েছে। হযরত আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আমার পিতাও কি একথা জানেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। হযরত আয়েশা (রা.) আবার বলেন, আর মহানবী (সা.)? তিনি তার মাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, মহানবী (সা.)ও জানেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একথা শুনে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর আমি কাঁদতে থাকি। হযরত আবু বকর (রা.) আমার (কান্নার) শব্দ শোনেন, তখন তিনি বাড়ির ওপরতলায় কুরআন পড়ছিলেন, তিনি নিচে এসে আমার মাকে বলেন, তার কী হয়েছে? তিনি বলেন, তার সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা সে জানতে পেরেছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.)'র চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি নিজের বাড়ি ফিরে যাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ফেরত চলে আসি।

ইফ্‌কের ঘটনার ক্ষেত্রে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন,

আমাদের প্রণিধান করা উচিত যে, তারা কারা ছিল যাদের দুর্নাম করা মুনাফিকদের জন্য কিংবা তাদের সর্দারদের জন্য লাভজনক হতে পারত আর কাদের সাথে এর মাধ্যমে মুনাফিকরা নিজেদের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারত? হুযূর (রা.) বলেন, সামান্য চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, দু'জন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার কারণে হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ ঘটে থাকতে পারে; একজন হলেন মহানবী (সা.) এবং আরেকজন হযরত আবু বকর (রা.)। কেননা একজনের তিনি স্ত্রী আর অন্যজনের কন্যা ছিলেন। এই দু'জনই এমন ছিলেন যাদের দুর্নাম করা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে কিংবা শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারত। অথবা কতক মানুষের স্বার্থ তাদেরকে দুর্নাম করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অন্যথায় কেবল হযরত আয়েশা (রা.)'র দুর্নামে কারো কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। বড়জোর তার সাথে সতীনদের এমন সম্পর্ক হতে পারতো, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অন্য যে স্ত্রীরা ছিলেন, আর এই ধারণা করা যেত যে, হয়ত হযরত আয়েশা (রা.)'র সতীনেরা হযরত আয়েশাকে মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় করতে এবং নিজেদের সুনামের জন্য এ বিষয়ে কেউ অংশ নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, হযরত আয়েশা (রা.)'র সতীনেরা এ কাজে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করেন নি। বরং হযরত আয়েশা (রা.)'র নিজের বক্তব্য হলো, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে স্ত্রীকে আমি আমার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতাম তিনি ছিলেন হযরত যয়নব (রা.); তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি আমার প্রতিপক্ষ জ্ঞান করতাম না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যয়নবের এই অনুগ্রহ কখনো ভুলতে পারব না যে, যখন আমার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় তখন সর্বাধিক জোর দিয়ে কেউ যদি এই অপবাদ অস্বীকার করে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন হযরত যয়নব (রা.)।

অতএব হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে যদি কারো শত্রুতা হওয়া সম্ভবপর ছিল তবে তা তার সতীনদেরই পক্ষ থেকেই ছিল। আর তারা চাইলে এতে অংশ নিতে পারতেন যেন হযরত আয়েশা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যান এবং তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা, অর্থাৎ অন্য স্ত্রীরা এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপই করেন নি। বরং (এ বিষয়ে) কাউকে জিজ্ঞেস করা হলেও হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রশংসাই তিনি করেছেন। অতএব আরেকজন স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন তার কাছে এ বিষয়টির উল্লেখ করেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি তো আয়েশার মাঝে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। কাজেই, হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি কারো শত্রুতা করার সম্ভাবনা থাকলে তা ছিল তাঁর সতীনদের পক্ষ থেকে, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোনরূপ সম্পৃক্ততা সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে নারীদের প্রতি পুরুষদের শত্রুতারও কোনো কারণ নেই। অতএব হয় মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে তার (রা.) প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, কিংবা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষের কারণে এমনটি করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তা ছিনিয়ে নেয়া অপবাদ আরোপকারীদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাদের যে বিষয়টির ভয় ছিল তা

হলো, পাছে মহানবী (সা.)-এর পরেও তারা আবার নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ না হয়ে যায়। কেননা তারা দেখতে পাচ্ছিল, তাঁর (সা.) পরে খলীফা হবার যোগ্য বলে কেউ থেকে থাকলে তিনি আবু বকর (রা.)-ই বটে। অতএব এই শঙ্কাকে আঁচ করতে পেরেই তারা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে খাটো হয়ে যান আর তাঁর (এই) সম্মানহানীর কারণে মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র যে মর্যাদা রয়েছে তা-ও হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলমানরা তাঁর, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি কুধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা তারা পরিত্যাগ করে। আর এভাবে যেন মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র খলীফা হবার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যেভাবে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র জীবদ্দশায় লাহোরীদের দল আমার প্রতি আপত্তি করতো এবং আমার দুর্নাম করার চেষ্টায় থাকতো। অতএব একারণেই খোদা তা'লা হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর অপবাদ আরোপের ঘটনার পর খিলাফতেরও উল্লেখ করেন। হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করতেন আর বলতেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি কারো মর্যাদা থেকে থাকে, তবে সেই মর্যাদা কেবল আবু বকরেরই রয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী (সা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমার অমুক চাহিদা পূরণ করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন না, পরে এসো। সে ছিল বেদুঈন, সভ্যতা-ভব্যতা কাকে বলে তা সে জানতো না। সে সোজাসুজি বলে বসে, আপনিও তো মানুষ! পরেরবার যখন আমি আসব তখন যদি আপনি মারা যান তাহলে আমি কী করব? তিনি (সা.) বলেন, আমি যদি পৃথিবীতে না থাকি তাহলে আবু বকরের কাছে চলে যেও; সে তোমার প্রয়োজন পূরণ করবে। একইভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! আমি আমার পর আবু বকরকে মনোনীত করে যেতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমি জানি, আল্লাহ্ এবং মু'মিনরা তাকে ছাড়া আর কারো ব্যাপারে একমত হবে না। এজন্য আমি কিছু বলছি না। মোটকথা, সাহাবীরা স্বাভাবিকভাবেই এটি জানতেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর তাদের মধ্যে থেকে যদি কারো কোনো পদমর্যাদা থেকে থাকে তবে তা আবু বকরেরই (রয়েছে) আর তিনিই তাঁর (সা.) খলীফা হবার যোগ্য। মক্কা-জীবন তো এমন ছিল যে, তখন রাজত্ব বা প্রশাসন পরিচালনার কোনো প্রশ্নই উঠতো না, কিন্তু মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় আর স্বাভাবিকভাবেই মুনাফিকদের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগতে আরম্ভ করে। কেননা তাঁর (সা.) মদীনায় আগমনের ফলে তাদের অনেক আশার গুড়ে বালি হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন দেখে, তার রাজা হবার সকল সম্ভাবনার সলিল-সমাধি ঘটছে তখন তার খুবই রাগ হয়। যদিও সে বাহ্যত মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল, তথাপি সবসময়ই সে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকতো। আর সে যেহেতু এখন আর

কিছুই করতে পারছিল না তাই তার অন্তরে কোনো বাসনা জাগ্রত হলে তা কেবলমাত্র এটিই যে, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেলে আমি মদীনার বাদশাহ্ হব। কিন্তু যখনই মুসলমানদের মাঝে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আর সে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে তখন তারা মহানবী (সা.)-কে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে যে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ম-কানুন কী? তাঁর (সা.) (তিরোধানের) পরে ইসলামের কী অবস্থা হবে আর এক্ষেত্রে মুসলামানদের করণীয় কী? আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন এই অবস্থা দেখে তখন তার মাঝে এ ভীতি সঞ্চারিত হতে থাকে যে, এখন ইসলামি শাসনব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে তার কোনো অংশ বা কর্তৃত্ব থাকবে না। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্র কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। সে এই অবস্থাকে প্রতিহত করতে চাচ্ছিল। কাজেই এজন্যে সে যখন চিন্তাভাবনা করে তখন দেখতে পায়, কেউ যদি ইসলামি রাষ্ট্রকে ইসলামী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। কেননা মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতিই নিবদ্ধ হয়। এছাড়া তারা তাঁকে অন্য সবার চেয়ে সম্মানিত মনে করে। অতএব সে (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই) তাঁর [অর্থাৎ আবু বকর (রা.)'র] দুর্নাম রটানো এবং মানুষের দৃষ্টিতে আবু কবর (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার মাঝেই নিজের কল্যাণ দেখতে পায়। বরং স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতেও তাকে হেয় করা যায়। আর এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার মোক্ষম সুযোগ সে হযরত আয়েশা (রা.)'র একটি যুদ্ধাভিযানে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনায় পেয়ে যায় এবং এই নিকৃষ্ট লোকটি তাঁর [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)'র] ওপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করে যা পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের দুরভিসন্ধি ছিল, এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের দৃষ্টিতেও লাঞ্ছিত হবেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথেও তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে যা প্রতিষ্ঠা হওয়া তার দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী ছিল। অর্থাৎ সে দেখছিল, অবশ্যই এটি হবে আর যা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সকল আশার গুড়ে বালি পরবে। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের দিবাস্বপ্ন কেবলমাত্র আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলই দেখছিল না, বরং আরো কয়েকজন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। মুনাফিকরা যেহেতু নিজেদের মৃত্যুকে সর্বদা অনেক দূরে মনে করে এবং তারা অন্যদের মৃত্যু সম্পর্কে অনুমান করতে থাকে, তাই আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও নিজের মৃত্যুকে অনেক দূরের বিষয় বলে মনে করতো। কিন্তু সে জানতো না যে, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাবে। সে এই ধারণা করতে থাকত যে, মহানবী (সা.)-এর মারা গেলে আমিই আরবের বাদশাহ্ হব। কিন্তু এখন সে দেখল যে, আবু বকর (রা.)'র পুণ্য, তাকওয়া এবং মাহাত্ম্য মুসলামানদের মাঝে স্বীকৃত। যখন মহানবী (সা.) নামায পড়ানোর জন্য না আসতেন তখন আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) স্থলে নামায পড়াতেন। মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেলে মুসলমানরা আবু বকর (রা.)'র

নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করে। এটি দেখে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল, যে ভবিষ্যতে শাসনক্ষমতা লাভের স্বপ্নে বিভোর ছিল, (সে) ভীষণ চিন্তিত হয় আর এর একটি বিহিত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। অতএব এই বিষয়ের বিহিত করতে এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র সুখ্যাতি ও মাহাত্ম্যকে মুসলামানদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করতে সে হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর অপবাদ আরোপ করে, যেন হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর অপবাদ আরোপিত হবার কারণে তার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ঘৃণা সৃষ্টি হয়, আর হযরত আয়েশার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ঘৃণার ফলশ্রুতিতে যেন হযরত আবু বকর (রা.)'র সেই সম্মান হ্রাস পায় যা মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাঁর রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁর আর যেন খলীফা হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। অতএব এ বিষয়টিই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡ (সূরা আন্ নূরঃ ১২) অর্থাৎ যারা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল তারা তোমাদের মধ্য থেকেই মুসলমান নামধারী একটি দল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَا تَحۡسَبُوهُ شَرّٗا لَّكُم بَلۡ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُم (সূরা আন্ নূরঃ ১২)। অর্থাৎ তোমরা মনে করো না যে, এই অপবাদ কোনো মন্দ ফলাফল সৃষ্টি করবে, বরং এই অপবাদও তোমাদের মঙ্গল ও উন্নতির কারণ হবে। অতএব আল্লাহ্ বলেন, এসো, এখন আমি খিলাফতের বিষয়েও মূলনীতি বলে দেই। এছাড়া তোমাদেরকে একথাও বলে দেই যে, এসব মুনাফিকরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দেখুক, এরা বিফলই থাকবে আর আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ব। কেননা খিলাফত নবুয়্যতের একটি অংশ এবং ঐশী নূর সুরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

দেখুন! সূরা নূরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে একটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে এই অপবাদের উল্লেখ করেছেন যা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-কে অপদস্থ করা এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর যে সুসম্পর্ক রয়েছে তা যেন নষ্ট হয় আর এর ফলে মুসলমানদের দৃষ্টিতেও তাঁর সম্মান হ্রাস পায় এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি যেন খলীফা না হতে পারেন। কেননা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বুঝে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি যদি কারো প্রতি নিবদ্ধ হয় তবে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.); আর হযরত আবু বকর (রা.)'র মাধ্যমে যদি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের বাদশাহ্ হওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা এই আপত্তির কথা উল্লেখের অব্যবহতি পরেই খিলাফতের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, খিলাফত রাজত্ব নয়; এটি তো ঐশী নূর প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি মাধ্যম, তাই এর প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। এটি বিনষ্ট হওয়া তো নবুয়্যতের নূর এবং ঐশী জ্যোতি বিনষ্ট হওয়ার নামান্তর। তাই তিনি এ নূরকে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত করবেন এবং নবুয়্যতের পর কোনোক্রমেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দিবেন না আর যাকে ইচ্ছা খলীফা বানাবেন। বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুসলমানদের মধ্যে থেকে কেবল একজন নয় বরং বেশ কয়েকজনকে

খিলাফতের আসনে সমাসীন করে নূরের যুগ দীর্ঘায়িত করবেন। এটি তেমনই একটি বিষয় যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, খিলাফত জাফরানী দোকানের সোডা পানি নয় যে, যার ইচ্ছা পান করে নিবে। অনুরূপভাবে বলেন, তোমরা যদি অভিযোগ করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে কর, কিন্তু এর দ্বারা তোমরা খিলাফতকেও নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না আর হযরত আবু বকর (রা.)-কেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। কেননা খিলাফত হলো একটি নূর আর সেই নূর আল্লাহ্‌র জ্যোতির্বিকাশের একটি মাধ্যম। মানুষ তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে কীভাবে নির্বাপিত করতে পারে?

তিনি (রা.) আরো বলেন, এভাবে খিলাফতের এই নূর আরো কয়েকটি বাড়িতেও পাওয়া যায় আর কোনো মানুষই তার চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই জ্যোতির্বিকাশকে প্রতিহত করতে পারে না।

মোটকথা, খিলাফত সম্পর্কে এটি তাঁর একটি প্রবন্ধ অথবা তিনি এ বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলেন। এর দ্বারা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.)'র যে মাকাম বা মর্যাদা ছিল আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার যে ব্যবহারিক সাক্ষ্য ছিল তা থেকেও সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবুয়্যতের অব্যবহতি পর খিলাফতের যে সিলসিলাহ্ বা ধারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অব্যাহত হওয়ার ছিল তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু এরপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তা পরের কথা আর পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাপনা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সাথে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং তাঁকে কষ্ট দেয় কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন। সে দ্বিতীয়বার কষ্ট দেয়, তখনও হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার কষ্ট দিলে হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিশোধ নিলে মহানবী (সা.) উঠে দাঁড়ান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, ঊর্ধ্বলোক থেকে এক ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়েছিল যে সেসব কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল যা সে তোমার সম্পর্কে বলছিল। কিন্তু তুমি যখন প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এসে পড়ল আর যে সভায় শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে আমি সেই সভায় বসতে পারি না। মহানবী (সা.) আরো বলেন, হে আবু বকর! এমন তিনটি বিষয় আছে যা সব সময় সঠিক। কোনো মানুষের প্রতি যদি কোনো কিছুর মাধ্যমে অন্যায়-অবিচার করা হয় এবং সে যদি কেবল আল্লাহ্ তা'লার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে নিজ সাহায্যে সম্মানিত করেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো অনুদানের দ্বার উন্মুক্ত করে তাকে আল্লাহ্ তা'লা এর দ্বারা সম্পদে প্রাচুর্য দান

করেন। তৃতীয় বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের কাছে যাচনা করতে আরম্ভ করে তার জন্য এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা অভাব-অনটনই বৃদ্ধি করে দেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আবু বকর (রা.)'র গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

তিনি (রা.) একজন পূর্ণমাত্রার তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাব বিশিষ্ট এবং খুবই দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে এবং দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেত। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তাঁর নেতা ও অগ্রনায়ক আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছাদিত করেছিল। মহানবী (সা.)-এর জ্যোতির মনোহর ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণের ছত্রছায়ায় আশ্রিত ছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর সামনে পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী উন্মোচিত হওয়ার পর তিনি সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে স্বীয় প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান। এছাড়া শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরেই নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন এবং সকল প্রকার জাগতিক কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে তাঁর আত্মা এক পরম সত্য ও এক–অদ্বিতীয় খোদার রঙে রঙ্গীন হয়ে যায় আর বিশ্ব প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করে দেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরায় এবং হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নেয় আর তাঁর কথা এবং কাজে, ওঠা ও বসায় সেই প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি 'সিদ্দীক' নামে ভূষিত হন আর সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার পক্ষ থেকে অনেক বেশি সতেজ বা নতুন ও গভীর জ্ঞান তাঁকে দান করা হয়। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয় আর এরই ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, ওঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম ছিলেন এবং নবীদের গুণাবলীসম্পন্ন মনোনীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, **আমাদের একথাকে তুমি কোনো অতিশায়োক্তি মনে করবে না আর একে তুমি পক্ষপাতমূলক আচরণ ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় জ্ঞান করবে না এবং একে তুমি প্রেমের আতিশয্যও মনে করবে না, বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।**

হযরত আবু বকর (রা.)'র এই যে পদমর্যাদা তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং এত যে গুণকীর্তন করেছেন– এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা আমার নিকট এগুলো, অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন**। তিনি (আ.) আরো বলেন,

জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশি মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল ও মনিব (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সম্বন্ধ ছিল আর এ কারণেই তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে এমন সব আশিসে ভূষিত হয়েছেন যে, অন্যরা তা সুদীর্ঘ কালক্ষেপণ এবং সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও লাভ করতে পারে নি।

মহানবী (সা.)-এর ১৪জন সাথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীকে সম্মানিত ৭জন সাথি দেয়া হয়েছে অথবা শুধু সাথি (দেয়া হয়েছে) বলেছেন, কিন্তু আমাকে ১৪জন সাথি দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁর (রা.) সমীপে নিবেদন করি, তাঁরা কে কে? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি ও আমার দুই ছেলে, অর্থাৎ হযরত আলী ও তাঁর দুই ছেলে এবং হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বিলাল, হযরত সালমান, হযরত আম্মার, হযরত মিকদাদ, হযরত হুযায়ফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.)।

মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীরের দায়িত্বও প্রদান করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি (সা.) হজ্জ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন তাঁকে বলা হয়, মুশরিকরা অন্য লোকদের সাথে একসাথে হজ্জ করে এবং অংশীবাদিতামূলক বাক্যাবলী বলে থাকে এবং নগ্ন হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করে। একথা শুনে মহানবী (সা.) এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে (মক্কার উদ্দেশ্যে) প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ৩শ' সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর মহানবী (সা.) তাঁদের সাথে ২০টি কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন এবং সেগুলোর গলায় মহানবী (সা.) নিজ হাতে কুরবানী চিহ্নস্বরূপ গানিয়া বা মালা পরান এবং চিহ্নিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং সাথে করে ৫টি কুরবানীর পশু নিয়ে যান।

রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলোর ঘোষণা এই হজ্জের সময়-ই দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময়

এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণের শুরুর দিকে একবার খুতবায় আমি তুলে ধরেছি। যাহোক, সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। যখন সূরা বারাআত, অর্থাৎ সূরা তওবা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইতঃমধ্যে হজ্জের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন এই সূরা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে সেখানে তিনি (রা.) এটি পড়ে দেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, আমার আহলে বায়তের অন্তর্গত কোনো মানুষ ছাড়া অন্য কেউ এই দায়িত্ব আমার পক্ষ থেকে পালন করতে পারে না। তখন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, সূরা তওবার শুরুতে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন মানুষ যখন মিনায় একত্রিত হবে তখন তাদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দেবে যে, কোনো কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করার অনুমতি পাবে না আর নগ্ন দেহে কাবা শরীফ তওয়াফের অনুমতিও কেউ পাবে না। কিন্তু মহানবী (সা.) যার সাথে কোনো চুক্তি করেছেন সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। হযরত আলী (রা.) এই ফরমান বা আদেশ নিয়ে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত আলী (রা.)-কে পথিমধ্যে দেখতে পান অথবা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে না কি আপনি আমার অধীনস্থ হবেন? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, আমি আপনার অধীনস্থ হব। এরপর উভয়ে (একসাথে) যাত্রা করেন। [আমি আপনার অধীনস্থ হব, তবে এই আয়াতগুলো আমি পাঠ করে শোনাব।] যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের হজ্জের বিষয়াবলীর তদারকী করেন। সে বছর আরববাসী সেখানেই তাদের তাঁবু খাটায় যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাঁবু খাটাতো। কুরবানীর দিনে হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী লোকদের মাঝে সেই বিষয় ঘোষণা করেন যে বিষয়ে (ঘোষণা) করার জন্য মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেই উপস্থাপন করেছি। হযরত আবু বকর (রা.)'র এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, চৌধুরী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের পুত্র মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মুহাম্মদ দাউদ যাফর সাহেবের, তিনি এখানে যুক্তরাজ্যে রাকীম প্রেসে (কর্মরত) ছিলেন। ১৬ নভেম্বর ৪৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার জানাযা (বাহিরে) রাখা আছে, ইনশাআল্লাহ্ জুমুআর নামাযের পর আমি জানাযাও পড়াব। ১৯৯৮ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর মুরুব্বি সিলসিলাহ্ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং ২০০১ সালে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। এখানে ইসলামাবাদের রাকীম প্রেসে তার পদায়ন হয়। অত্যন্ত আগ্রহের

সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের সাথে খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল। ইসলামাবাদে অবস্থানকালে কিছুদিন ইসলামাবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। উমরা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা এবং স্ত্রী ছাড়াও ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রয়েছে।

তার পিতা চৌধুরী ইউসুফ সাহেব বলেন, দাউদকে মুরুব্বী হওয়ার প্রস্তাব দিলে সে আমার এই বাসনা পূর্ণ করে। কেউ কেউ তাকে বলেছে, মুরুব্বী হওয়ার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা অর্জনের জন্য এতটা চেষ্টা করলে সে অনেক ভালো চাকরি পেতে পারে এবং নিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরো উন্নত করতে পারে। কিন্তু এমন পরামর্শকে দাউদ সাহেব পুরোপুরি নাকচ করে দেন। জামেয়া থেকে শাহেদ (পাশ করে) মুরুব্বী হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালন করেছে। খুবই অনুগত পুত্র ছিলেন। তার পিতা বলেন, আমার সব কথা মান্য করত। কখনো অস্বীকার করে নি। সর্বদা আমাকে সুখ দেয়ার চেষ্টা করেছে। আর্থিক কষ্ট সত্ত্বেও কখনো নিজ ওয়াক্‌ফ পরিত্যাগের চিন্তাও করে নি। তিনি বলেন, জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশোনার সময় আর্থিক কষ্টের দরুন, সাইকেল পাংচার হয়ে গেলে তার কাছে সেই পাংচার সারানোর মতো অর্থও থাকত না। বাড়ি থেকে (চাকায়) হাওয়া দিয়ে জামেয়াতে যেত এবং ফিরে আসার সময়ও এমনটিই করত। কখনো কোনো অভিযোগ করে নি। যুগ–খলীফার আনুগত্যকারী এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুধাবনকারী মুরুব্বী ছিল।

তার স্ত্রী মুবারাকা সাহেবা বলেন, আমরা ২২ বছর একত্রে ছিলাম। তাকে আমি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, পরিশ্রমী, খোদার ওপর সীমাহীন ভরসাকারী এবং প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সেবাকারী হিসেবে দেখেছি। জীবনে অনেকবার এমন হয়েছে যখন কিছু কিছু বিষয় বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়েছে তখন আমি বলতাম, এটি কীভাবে হবে? তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে আর আল্লাহর কৃপায় এমটিই হত। সন্তানদের সর্বদা উপদেশ দিতেন, ভালো মানুষ হবে, কখনো কারো জন্য কষ্টের কারণ হবে না। সন্তানদের বসিয়ে প্রায়শই একথা বলতেন যে, আজ আমি যে অবস্থানেই আছি তা কেবল খিলাফতের কল্যাণেই এবং জামা'তের কারণে আছি। আল্লাহ্ আমাকে তৌফিক দিন আমি যেন আমার ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি। সর্বদা তার এমন বাসনাই ছিল।

তার বড় মেয়ে দারমানা সাহেবা বলেন, তিনি আমাদের কাছে কেবল একটি জিনিসই চাইতেন আর তা হলো, আমরা যেন আদর্শ আহমদী মুসলমান হই এবং নিজেদের আশপাশের লোকদের প্রতি যেন যত্নবান থাকি আর আমাদের কারণে যেন কারো কোনরূপ কষ্ট না হয়।

বড় ছেলে রোহান বলে, আমার বাবা আমাদের আধ্যাত্মিক তরবীয়তের বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। আমরা যখনই কোন প্রশ্ন করতাম তিনি একজন মুরব্বী হওয়ার সুবাদে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতেন।

তার ছোট ছেলে ফুয়াদ দাউদ, এখন তার বছর ১৫ বয়স। সে বলে, শেষ দিনগুলোতে তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন (তার ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল আর শেষদিনগুলোতে তা চরমরূপ ধারণ করেছিল) তাই মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে একটি সুন্দর জীবন যাপন করতে দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কিছুটা ভিন্ন আর আমি তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট।

যাহোক, সন্তানদেরকে সর্বদা পুণ্যের এবং জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তার নসীহতসমূহের ওপর আমল করার তৌফিকও দিন আর তাদের জন্য তার দোয়াও তিনি কবুল করুন। একথাটি তার পরিচিত সব মুরব্বীরা লিখেছেন যে, সাধারণত তিনি খুবই হাস্যোজ্জল ও (মজার) আসর জমাতে সক্ষম, হৃদয় আকৃষ্টকারী এবং সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন। নিজ পেশার ক্ষেত্রে তিনি কম্পিউটার এবং শিল্পকর্মে পারদর্শী ছিলেন। তিনি মুরব্বী ছিলেন কিন্তু টেকনিক্যাল কাজেও তার মেধা ছিল, এছাড়া এডিটিং ও এধরনের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি রাকীম প্রেসে অনেক ভালো কাজ করেছেন। তার মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর অনেক সুযোগ তিনি পেয়েছেন। জামা'তের কাজ করাকে তিনি সর্বদা খোদার একান্ত কৃপা এবং নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন।

এছাড়া তার এক আত্মীয় এটিও লিখেছে যে, নিরবে তিনি অন্যের সাহায্য করতেন। খুবই গোপনে তিনি অভাবী মানুষ এবং আত্মীয়স্বজনকে আর্থিক সাহায্যও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদেরও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন আর তাদেরকে তার পুণ্যগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন এবং তার পিতামাতাকেও (তিনি) ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দুটি গায়েবানা জানাযাও রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম জানাযাটি **স্পেনের সাবেক মুবাল্লিগ জনাব করম এলাহী জাফর সাহেবের স্ত্রী রুকাইয়া শামীম বুশরা সাহেবার**। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ১৯৩২ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি স্পেনের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসাবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তার তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। তার এক পৌত্র ওয়াকফে নও ওয়াকেফে যিন্দেগী আতাউল মু'নিম তারেক কেন্দ্রীয় স্প্যানিশ ডেস্কের ইনচার্জ। এক পৌত্রীর বিয়েও জামাতের মুরব্বীর সাথে হয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃপায় তার দুই ছেলেও ধর্মসেবা করছেন। তার বড় ছেলে (জামাতের) নায়েব আমীর। রুকাইয়া সাহেবার দাদা হলেন, মৌলভী ফখরুদ্দীন সাহেব এবং দাদি হলেন, সাহেব বিবি সাহেবা যিনি মূলত ভেরা নিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বয়আ'ত করার পর তারা কাদিয়ানে চলে যান। তার নানা ছিলেন ভাই আব্দুর রহীম সাহেব তিনি আজমীর নিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি শিখ ধর্মের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আ'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিনিও বয়আ'ত করার পর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান চলে আসেন। এজন্য নানার পরিবার এবং দাদার পরিবার উভয়ই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রুকাইয়া বেগম সাহেবা সম্পর্কে তার ছেলে লিখেছেন, দাওয়াতুল আমীর পুস্তকের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এটি কয়েকবার পড়েছেন। তিনি বলতেন, এ পুস্তক পড়ার পর আমার মাথায় থাকা অনেক সংশয় ও সন্দেহের উত্তর পেয়ে গেছি। ১২ বছর বয়স থেকেই নামাযের প্রতি খুবই আন্তরিক

ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই মর্মে কাকুতিমিনতি করতেন যে, তিনি যেন তাকে ঈমানের পথ ও সীরাতে মুস্তাকিম তথা সহজসরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন। পর্দার ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন। জামা'তের অন্য নারীদের জন্য আদর্শ ছিলেন। অসুস্থ ও অভাবীদের প্রতি গভীর সমবেদনা রাখতেন। সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। প্রাথমিক যুগে যখন স্পেনে আসেন তখন মওলানা সাহেবের সাথে তাকে সেখানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবলীগ করার কারণে মওলানা সাহেবকে প্রায়ই পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যেত অথবা বাড়িতে অভিযান চালাত। পুলিশ তবলীগি কার্যক্রম প্রমাণের জন্য (বাড়িতে) তল্লাশি চালাত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর স্বামীর মত তিনিও এই বিশ্বাসে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন এবং সমস্ত বিপদাপদ দূর করে দিবেন।

তাঁর পুত্র লিখেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন মওলানা সাহেবকে কর্ডোভাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান সন্ধান করার নির্দেশ দেন তখন তিনিও এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। মসজিদে বাশারতের নির্মাণকাজ যখন আরম্ভ হয় তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর স্বামীর সাথে বাসে চেপে কর্ডোভা থেকে পেড্রোয়াবাদ পর্যন্ত নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আসতেন। সমস্ত খরচাদির রেকর্ড তাঁর নিকট থাকত। মসজিদের নির্মাণকাজে তিনি রীতিমত হিসবারক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর পুত্র ফযল ইলাহী কমর বলেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র উপদেশকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টিপটে রেখেছেন। তিনি (রা.) বলেছিলেন, **আপনার দায়িত্বকে দৃষ্টিপটে রাখবেন এবং স্বামীকে সৎপরামর্শ দিবেন। আপনি এমন একটি দেশে যাচ্ছেন যেখানে আপনি আপনার স্বামীকে তবলীগের কাজে অলস হতে দিবেন না, বরং তাকে আরো তৎপর রাখতে হবে। একসাথে থাকার জন্য মৃত্যুর পর অফুরন্ত সময় পাওয়া যাবে– এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আপনাকে জীবনের এই দিনগুলোতে কাজের সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।** যাহোক, তিনি এই উপদেশ মেনে চলেন। সকল পরিস্থিতিতেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রেখে ধৈর্য ও মনোবল প্রদর্শন করেছেন। প্রাথমিক যুগ খুবই কঠিন ছিল কিন্তু তিনি তা-ও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সহ্য করেছেন। ধর্মকে সর্বদা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র উপদেশের ওপর আমল করে ইউরোপের এমন একটি দেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে এক যুগে ইসলামের নাম উচ্চারণ করাও অপরাধ মনে করা হতো। স্পেনে আহমদীয়াতের তবলিগী কার্যক্রম প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তাঁর পুণ্যকর্ম ধরে রাখার সৌভাগ্য দিন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের কন্যা মোহতরমা তাহেরা হানিফ সাহেবার। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র পুত্র মরহুম মির্যা হানীফ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র পুত্রবধূ ছিলেন এবং আমারও মামি ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি আমি বলেছি, তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্

শাহ্ সাহেব। তিনি বুখারী শরীফের বেশ কয়েকটি খণ্ডের তফসীর বা ভাষ্যও লিখেছেন। তিনি অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি বিভিন্ন আরব দেশেও বাস করেছেন। তাঁর, অর্থাৎ তাহেরা বেগম সাহেবার মাতার নাম সৈয়দা সিয়ারা সাহেবা। তিনি দামেস্কের অধিবাসিনী ছিলেন, তিনি আরব ছিলেন। তাঁর দাদা হযরত ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন হয়। তিনি ১৯০১ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আ'ত করেন এবং এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গোটা বংশের শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে স্বপ্নযোগে সঠিক পথের দিশা দিয়ে তাদের ঈমান দৃঢ় করতে থাকেন। হযরত ডাক্তার আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র নানা ছিলেন। এ দিক থেকে ইনি তার মামাতো বোন ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া তাহেরা সাহেবা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার সেক্রেটারী এসলাহ্ ও এরশাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া সিয়েরা লিওনেও তার ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে কয়েক বছর কাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান দান করেছেন।

তার বড় মেয়ে আমাতুল মু'মিন সাহেবা বলেন, আমরা আমাদের মাকে সর্বদা পাঁচবেলার নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামায ও নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়তে ব্যস্ত দেখেছি, বরং ইশরাক ও অন্যান্য নামাযও তিনি পড়তেন। কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে দেখি নি। সবকিছুই তিনি পরম আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে করতেন। ইবাদতও অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং একাগ্রতার সাথে করতেন। তিনি বলেন, আমি ভেবে অবাক হতাম যে, এগুলি করার পরও জাগতিক কাজকর্ম তিনি কীভাবে করতেন। শ্বশুরবাড়ির অধিকার, প্রতিবেশির অধিকার, আমার বাবার দেখাশোনা করা, আমাদের সবার পানাহারের চিন্তা করা। এছাড়া অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। জামা'তের সাথে আন্তরিকতা, তার জীবনে যে কজন খলীফাকে পেয়েছেন তাদের সবার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ওসীয়্যতের ব্যাপারে সর্বদা চিন্তা করতেন। যুগ-খলীফার কাছে চিঠি লিখার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন আর বলতেন, চিঠি লিখে প্রশান্তি পাওয়া যায়। আমাকেও নিয়মিত চিঠি লিখতেন, বরং প্রত্যেক খুতবার পর প্রায়শই তার চিঠি আসত আর তাতে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য থাকতো। কোনো বিষয় তাঁর ভালো লাগলে সেটির উল্লেখ তিনি বিশেষভাবে চিঠিতে করতেন। কখনোই কোনো আপত্তিকর কথা উল্লেখ করতেন না, বরং যদি আমাকে জড়িয়ে এমন কোনো কথা উঠত তাহলে তিনি বলতেন, আপত্তিকর বিষয়াদিতে (আমাদের) জড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। আমি এসব বিষয়ে সর্বদা ক্ষতিই হতে দেখেছি কখনো কোনো কল্যাণ হতে দেখি নি।

যেমনটি আমি বলেছি, খিলাফতের সাথে অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। দরিদ্র লোকদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন। আখতার সাহেব আমাকে লিখেন, আমার বাবা– আমার মা এবং আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদেরকে আশ্রয় দেন আর নিজের সন্তানের মতো (আমাদের) খোঁজখবর রাখেন। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনোই আমাদের অভাব অনুভূত হতে দেন নি।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। বুযূর্গদের পদতলে তাঁকে ঠাঁই দিন আর তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)